২

আশেক হাসপাতালে আসে খুবই তাড়াতাড়ি। এই হাসপাতালের ডে সিফটের কাজ শুরু হয় সাড়ে আটটায়। অথচ সে আসে আটটার আগে। আজ সকালেও বরাবরের মতোই হাসপাতালে এসে ডাক্তার কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হয়ে দেখলো, কক্ষের ভেতর রাখা লম্বা সোফাটার উপরে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে আহমেদ। শুধু তাই নয়, কক্ষের ভেতরে দড়ি টাঙিয়ে শুকোতে দিয়েছে তার ভেজা কাপর চোপর। কিছু কাপর চোপর আবার চেয়ারের হাতলের উপর। কক্ষের এই হাল দেখে আশেকের মেজাজটা চড়ে গেলো সাথে সাথেই। সে তার হাতের ভাঁজ করা খবরের কাগজটা দিয়ে অনবরত আহমেদের মাথায় আঘাত করতে করতে বললো, এই ইস্টার্নী, এই টা কি ঘুমানোর জায়গা নাকি? এই উল্লুখ, উঠো।

একদিন একরাতের জার্নি, আর গতকালের সারাদিনের ক্লান্তিতে, এই সকালবেলায় ঘুমটা খুব গভীর হয়ে উঠেছিলো আহমেদের। আশেকের চেচামেচিতে সে উঠে বসলো ঠিকই, কিন্তু মাথার ভেতরটা কেমন যেনো ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আশেকের দিকে। আশেক দড়িতে টানানো অর্ধ ভেজা কাপর গুলো টেনে ছুড়তে লাগলো আহমেদের মুখের উপর। আর চেচিয়ে বলতে লাগলো, এইটা কি তোমার ছাত্রাবাস পেয়েছো নাকি? এই গর্দভ, তাড়াতাড়ি গুছাও সব!

সাকীব এসে ঢুকে আশেককে হৈ চৈ করতে দেখে বললো, কি ব্যাপার, এত হৈ চৈ কিসের?

আশেক বললো, দেখেন তো সাকীব ভাই, এই গর্দভ ঘরটার কি অবস্হা করেছে?

বলতে বলতে চেয়ারের হাতলে রাখা আণ্ডার ওয়েয়ারটা ছুড়ে মারলো ঠিক আহমেদের মুখের উপর।

সাকীব বললো, কি ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা। আহমেদ, তুমি কি তোমার থাকার জায়গা ঠিক করোনি?

আহমেদ তার মুখের উপর ছুড়ে ফেলা কাপর চোপর গুলো সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, মেঝের দিকে তাঁকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগলো। আহমেদের মনের কথা বুঝতে দেরী হলো না সাকীবের। থাকার জায়গা ঠিক করতে পারলেও ভাড়া দেবার মতো সাম্যর্থ তার আপাততঃ নেই। সাকীব, আশেকের দিকে তাঁকিয়ে বললো, আশেক, তুমি না কোন ম্যানসনে ফ্ল্যাট কিনেছো বলেছিলে? তুমি একা মানুষ, রুম তো সব খালিই পরে আছে, একটা রুমে না হয় আহমেদের থাকার ব্যাবস্হাটা করে দাও, কি বলো?

আশেক মুখ বিকৃত করে, খিচিয়ে বললো, এই উল্লুখটাকে? আমার ফ্ল্যাটে? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি সাকীব ভাই?

সাকীবের কথায় আহমেদ কিছুটা আশার আলো দেখেছিলো, অথচ, আশেক নাকচ করে দেয়াতে নুতন একটা উপায়ের আশায় সাকীবের দিকে তাঁকিয়ে রইলো সে। আহমেদের তাঁকানোর ভঙি দেখে সাকীবের কেনো যেনো মনে হলো, আহমেদ তার নিজের বাড়ীতে থাকার কথা ভাবছে। সাকীব নিজে থেকেই আমতা আমতা করে বলতে লাগলো, আরে না, আমার বাড়ীতে

না। আমার বাড়ীতে ছোট বাচ্চা, নিজেদেরই সমস্যার কোন শেষ নাই। আবার তুমি এসে নিজেরই একটা ঝামেলা বাড়াবে শেষে। তুমি বরং এক কাজ করো। থাকার ব্যাবস্হা যতদিন ঠিক না হয়, আপাততঃ এখানেই থাকো।

তারপর আশেকের দিকে তাঁকিয়ে বললো, কি বলো আশেক? তোমার কোন আপত্তি?

আশেক সাকীবের মুখের উপর কিছু বলতে পারলোনা। সাকীবের এক তরফা সিদ্ধান্তে, রাগে গা রি রি করছে তার। সে আহমেদকে ধমক দিয়ে বললো, এই ফকির ইন্টার্নী, তাড়াতাড়ি ঘরটা একটু গুছাও, কি হাল করেছেরে বাবা!

আজ রহমান সাহেবের অপারেশনের ডেইট। সুমি রাত্রির পেছনে পেছনে তিনশ এগার নম্বর ওয়ার্ডে এসে ঢুকলো। কক্ষে ঢুকেই রাত্রি বললো, রহমান সাহেব খুব শীগগীরীই আপারেশন শুরু হবে। তার আগে একটা ইনজেকশন দিতে হবে আপনাকে।

তারপর সুমিকে বললো, সুমি, উনাকে ইনজেকশন দাও।

সুমিকে ইনজেকশন দিয়ে দিতে বলায় রহমান সাহেব রাগে কাঁপতে লাগলো। রহমান সাহেব সুমিকে জমের মতো ভয় পায়। সে অনেকটা ভয়ে জড়সড় হয়ে বললো, বলো কি রাত্রি? এই দজ্জাল মেয়েটা আমাকে ইনজেকশন দিবে?

রাত্রি বললো, হুম, কোন সমস্যা?

রহমান সাহেব বললো, তুমি কি আমার সাথে মজা করছো না তো?

রাত্রি গম্ভীর হয়ে বললো, না, মজা কেনো করবো? সুমিকে এসব শিখতে হবে এখন থেকে।

রহমান সাহেব বললো, না না বলো কি? অমি কি গিনিপিগ নাকি? এই দজ্জাল মেয়ে আমাকে ইনজেকশন দিয়ে, প্রেকটিস করবে? তা হয়না।

সুমিকে দজ্জাল মেয়ে বলাতে, মেজাজটা খুবই খারাপ হলো তার। সে দাঁতে দাঁত কামড়ে রাগ দমন করলো, কিছু বললোনা। ট্রলী থেকে সিরিঞ্জটা নিয়ে, ঔষধের শিশিতে সুই ঢুকিয়ে সিরিঞ্জটা ভর্তি করে নিলো ঔষধে। তারপর রহমান সাহেবের কাছে গিয়ে তার হাতটা টেনে, ইনজেকশনের সুই ঢুকাতে যেতেই সে হাত সরিয়ে নিলো। সুমি তার হাতটা টেনে ধরলো শক্ত করে। তারপর ইনজেকশনের সুই ঢুকাতে উদ্যত হলো। আর অমনি রহমান সাহেব সুমিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। সুমি তাল সামলাতে পারলোনা। মেঝেতে পরে গেলো সে পা ফসকে। আর তার হাতের ইনজেকশনটা ছুটে গিয়ে পরলো একেবারে রাত্রির কব্জির উপর।

রাত্রি ব্যাথাতে কঁকিয়ে উঠলো, উমা মরে গেলাম!

তাৎক্ষণিক ভাবে কি করবে বুঝতে পারছিলোনা রাত্রি। সে আতংকিত চোখে তাঁকিয়ে আছে কব্জির উপর বিঁধে থাকা ইনজেকশনটার দিকে। হাসপাতাল কক্ষের অন্য রোগীরাও অনুরূপ আতংকিত। সবাই এক ধরনের নিস্তব্ধতা নিয়ে তাঁকিয়ে আছে রাত্রির দিকে।

হঠাৎ রাত্রির কি হলো কে জানে? সে তার হাতটা সজোড়ে ঝাকি মারলো। সাথে সাথে ইনজেকশনটা তার কব্জির উপর তেকে সরে শূন্যে উড়ে গেলো।

বাবুল, বাদশা আর রতন মাঝে মাঝে তীর ছুড়াছুড়ির চর্চা করে এই হাসপাতালের কক্ষেই। তীরের নিশানার জন্যে সাদাকালো বৃত্ত একেছিলো তারা ঐপাশের দেয়ালে। রাত্রির কব্জি থেকে ইনজেকশনটা ছুটে গিয়ে পরলো ঠিক ঐ তীরের নিশানার বৃত্তের কেন্দ্রে। আর সেই দৃশ্য দেখে কক্ষের সবাই হাতে তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, চমৎকার চমৎকার!

রহমান সাহেবও বিরবির করে বললো, আশচর্য্য! সাংঘতিক তো এই মেয়ে!

সবার এই আনন্দের কারনটা কি, কিছুই বুঝতে পারছিলো না রাত্রি। সে তার হাতের ব্যাথাটা নিয়ে বোকার মতো এদিক ওদিক তাঁকাচ্ছিলো। সবার নজর ঐপাশের দেয়ালের দিকে। সেও তাঁকালো সেদিকে। যখন, ঐপাশের দেয়ালে তীরের নিশানার বৃত্তে বিঁধে থাকা ইনজেকশনটা চোখে পরলো, তখন সে তার হাতের ব্যাথা ভুলে গেলো বেমালুম। সে অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে হাতে তালি দিতে লাগলো আর লাফাতে লাগলো আনন্দে, নিজের এই কৃতকর্মের জন্যে।

অপারেশন থিয়েটারে ঢুকার আগে ডেটল আর সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে হাত পরিস্কার করছিলো আশেক আর আহমেদ। আশেক বললো, আহমেদ, তুমি যে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকতে যাচ্ছো, আজকের এই অপারেশনের ব্যাপারে কিছু লেখাপড়া করেছো?

আহমেদ বললো, স্টমাক ক্যান্সারের উপর অনেক আগে একবার পরেছিলাম। একটু একটু মনে আছে।

হাত ধুতে ধুতে বললো আশেক, তাহলে বলোতো, স্টমাক অপারেশনে স্টমাক কাটতে হয় কোন দিক থেকে, সামনে থেকে না পেছন দিক থেকে।

আশেকের প্রশ্নে অনেকটা থতমত খেয়ে গেলো আহমেদ। সে আমতা আমতা করতে লাগলো।

আশেক রেগে গেলো, তাহলে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকার কোন দরকার নেই। বেড় হও, বেড় হও বলছি এখান থেকে।

আহমেদের চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো মুহূর্তেই। সে কি করবে বুঝতে পারছিলো না। ঠিক তখুনিই ঢুকলো সাকীব। আহমেদের এক ধরনের ফ্যাকাশে চেহারা দেখে বললো, কি আহমেদ, আজকেতো তোমার জন্যে প্রথম অপারেশন, তাই না? মনের ভেতরে ভয় টয় নাই তো?

আশেক চেচিয়ে বললো, দেখেন সাকীব ভাই, এই গাধা স্টমাক অপারেশনে স্টমাক কোন দিকে কাটতে হয় তাও জানেনা। সে নাকি আবার অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবে বলছে!

সাকীব অবাক হবার ভান করে বললো, তাইতো? স্টমাক কোন দিকে কাটতে হয়?

সাকীবের কথা শুনে আহমেদ বোকা বনে গেলো। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁকিয়ে রইলো সাকিবের দিকে।

সাকীব হাতে ডেটল ঢালতে ঢালতে বললো, অনেকদিন অপারেশন করিনা বলে তো আমিও ভুলে গেছি। এক কাজ করো আহমেদ, আজকে তুমি আর আমি দুজনেই আশেকের কাছ থেকে স্টমাক কাটার ব্যাপারটা ভালো করে শিখে নেবো। কি বলো আশেক?

সাকীবের কথায় আহমেদ কিছুটা স্বস্তি পেলো। আর আশেক বলার মতো কোন ভাষা খোঁজে পেলো না। সে হাত ধুয়াতে মন দিলো।

রাধিকার সুপারভাইজার পদে ফিরে আসার ব্যাপারটা মোটেও সহ্য করতে পারছিলোনা লতিফা। এইসব ব্যাপারে প্রতিকার না করে চুপচাপ বসে থাকার মতো মহিলা ও সে নয়। সে সরাসরি নার্স সুপার মিনা রায়ের কক্ষে এসে ঢুকলো। মিনা রায় অবাক হয়ে বললো, কি ব্যাপার লতিফা, কিছু বলবে?

লতিফা বললো, রাধিকা সিস্টার তিনমাস ছুটিতে ছিলো। ছুটি কাটানোর পর কাজকর্মে অনেকটা গ্যাপ পরেছে তার। সরাসরি সুপারভাইজার পদের দায়ীত্ব দেয়াটা ঠিক হয়নি আপনার।

মিনা রায় বললো, ও সেই কথা? রাধিকার সুপারভাইজার হওয়াতে কি তুমি খুব উদ্বিগ্ন? সত্যি কথা বলতে কি, রাধিকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছে হাসপাতাল প্রশাসন কমিটির চ্যায়ারম্যান সহ সবাই। আমার কোন হাত ছিলো না সেখানে।

লতিফা বললো, সেটা কি, রাধিকা চীফ সার্জনের বউ বলে?

মিনা রায় হাসলো, বললো, হায় হায়, তুমিও কি সেই কথা ভাবছো? আসলে তুমি মনে হয় অনেক কিছুই জানো না। রাধিকা বিয়ের আগে থেকেই নার্স সুপারভাইজার ছিলো। এবং সে সুপারভাইজার হয়েছে তার নিজ দক্ষতায়, মাত্র তিন বছরের অভিজ্ঞতায়। লতিফা, তুমিও একদিন হয়তো বিয়ে করবে, বাচ্চা হবে, ছুটি ভোগ করবে। তাই বলে কি তোমাকে সিনীয়র নার্স থেকে জুনিয়র নার্সে নামিয়ে দেয়া যাবে?

লতিফা বোকা বনে গেলো, সে বললো, না আমি সে রকম কিছু বলছিনা, বলছিলাম?

মিনা রায় লতিফার কথার মাঝেই হাসতে হাসতে বললো, অবশ্য তার আগে পছন্দের ছেলে একজন খোঁজে বের করা চাই, তারপরই না বিয়ে, কি বলো লতিফা?

মিনা রায়ের কথায় সাংঘতিক লজ্জা পেয়ে গেলো লতিফা। এই বত্রিশ বছর বয়সে তাকে পছন্দ করে এমন কোন ছেলে এখনো নেই। এটা সত্যি কথা। সে কোন কথা না বলে, অনেকটা রেগে আগুন হয়ে দাঁত কামড়িয়ে বেরিয়ে গেলো মিনা রায়ের কক্ষ থেকে।

এই হাসপাতালে রাতের ডিউটিতে প্রতি বিভাগে সাধারণতঃ দুজন নার্স থাকে। সার্জারী বিভাগে আজকে রাতের ডিউটি পরেছে রাত্রি আর রাধিকার। শিক্ষানবীস সুমিরও আজ রাতের ডিউটি। তবে, এই হাসপাতালে নবাগতা নার্সদের, নার্স বলে গন্য করা হয়না।

রাতের ডিউটি সুমির জন্যে এই প্রথম। সুমির রাত জাগার তেমন কোন অভ্যাস নেই। হাসপাতালে নার্স হয়ে রোগীদের জন্যে রাত জেগে বসে থাকা তার জন্যে খুবি বিরক্তিকর।

রাধিকা ঔষধপত্রের একটা হিসাব কিতাব করছে ঐপাশের টেবিলে। সুমির তদারককারী হিসেবে রাত্রি তাকে এটা সেটা ব্যাখ্যা করছে। সুমির কান দিয়ে কিছুই ঢুকছেনা। রত্রি মাঝে মাঝে প্রশ্নও করছে সুমিকে। সুমি ঠিক মতো পারছিলোনা বলে সে ধমকও দিচ্ছে। রাধিকা আড় চোখে মাঝে মাঝে এদিকে তাঁকিয়ে আপন মনে হাসছে।

রাত্রি বললো, রাউণ্ডের সময় হয়ে গেছে। সুমি, তুমি এখন রাউণ্ডে যাও।

সুমি বিরক্তিভরা একটা চেহারা নিয়ে বললো, ঠিক আছে যাচ্ছি।

তারপর বিড়বিড় করে বললো, নার্সের চাকরীটা নিয়েই ভুল হয়েছে।

সুমি বেড়িয়ে যেতেই রাত্রি একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো, বললো, কিচ্ছু হবেনা এই মেয়েকে দিয়ে।

রত্রির কথা শুনে রাধিকা হাসি থামিয়ে রাখতে পারলোনা। রাত্রি বললো, হাসছো কেনো? আমি হাসির কি বলেছি?

রাধিকা বললো, তোর কথা শুনে আমি হাসছিনা, হাসছি তোর চেহারা দেখে।

রাত্রি বললো, চেহারা দেখে? আমার চেহারার আবার কি হলো?

রাধিকা বললো, সত্যিই তোকে দেখে মনে হচ্ছে সিরীয়াস একজন নার্স। নবাগতাদের তদারকী করা যে কি কঠিন, তা তোকে দেখে আমার পুরনো কথা মনে পরছে। এই তুই যে কতবার নার্সের চাকরীটা ছেড়েছিলি? আহারে, শেষবার যখন তুই কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতাল ছেড়েছিলি, আমার তো মনে হয়েছিলো তুই আর কোন দিন ফিরেই আসবিনা এই জগতে। এখন তোকে সিরীয়াস একজন নার্স দেখে মনটা ভরে গেলোরে!

রাত্রি বললো, সবই রাধিকা সিস্টারের কল্যানে।

রাধিকা বললো, আমার কল্যানে?

রাত্রি আহলাদে উপচে পরছে। সে বললো, হুম, এটা বলো সেটা বলো, সবি তোমার কল্যানে। তুমি না থাকলে আমার যে কি দশা হতো তা আমি নিজেই জানিনা। সবসময় তোমার কথা ভেবে ভেবে মনে মনে কত যে ধন্যবাদ দিই তোমাকে।

রাধিকার মনটা শিশুর মতো কোমল। সে রাত্রির কাছে এগিয়ে এসে, তার হাত দুটি ধরে বললো, আমিও তোর দিন দিন উন্নতি দেখে খুবি ধন্য। আমার মনে হয় তুই না থাকলে, অনেক আগেই আমি নার্সের চাকরীটা ছেড়ে দিতাম।

রাত্রি আনন্দে চোখ গোলগোল করে বললো, সত্যি সিস্টার!

রাধিকা রাত্রিকে জড়িয়ে ধরে বললো, সত্যি, তুই আমার সব।

রাত্রিও রাধিকাকে জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে।

পৃথিবীতে অনেক ধরনের ভালোবাসা আছে। রাত্রি আর রাধিকার মাঝে যে মনের টান তাও বুঝি এক ধরনের ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কত নিখুত, আর কেমন অকৃত্রিম!

টেলিফোনটা বেজে উঠলো হঠাৎ করেই। রাত্রি রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে গলা শুনা গেলো সাকীবের। রাত্রি অনেকটা হালকা গলায় বললো, আরে ডাঃ সাকীব, আপনি? ভেবেছিলাম ইমার্জেন্সী কোন রোগী কিনা! রাধিকা সিস্টার? আছে আছে, এই দিচ্ছি।

রাধিকা রিসিভার ধরেই বললো, কি হলো আবার এতো রাতে?

টেলিফোনের ওপাশ থেকে সাকীব বললো, বুঝতে পারছিনা, দিল অনবরত কাঁদছে শুধু।

রাধিকা বললো, দুধ খাইয়েছো?

সাকীব বললো, হুম।

রাধিকা বললো, প্রস্রাব পায়খানা করেছে মনে হয়, পাম্পার্স চেইঞ্জ করেছো?

সাকীব বললো, হুম।

রাধিকা বললো, জ্বর টর আছে নাকি?

সাকীব বললো, না, এই এক্ষুনি থার্মোমিটার দিয়ে মেপে দেখেছি। জ্বর টর নাই।

সাকীবের কোলে দিল কাঁদছে অনবরত। সাকীব বললো, কি করবো আমি এখন?

রাধিকা রাগ করার ভান করলো, কি করবে আমাকে বলছো কেনো? তুমি না ডাক্তার?

সাকীব অনুযোগ করে বললো, আহা তুমি বুঝতে পারছোনা, আমি সার্জারীর ডাক্তার, শিশুদের ব্যাপার স্যাপার ভালো বুঝিনা।

রাধিকা বললো, ঠিক আছে, জ্বর যখন নাই তখন চিন্তার কোন কারন নাই। আর একটু অপেক্ষা করে দেখো। যদি কান্না বন্ধ না হয়, তবে আবার একটা টেলিফোন করবে।

রাধিকা টেলিফোনটা রেখে দিলো ঠিকই, অথচ তার মনটা তখনো খুব চঞ্চল হয়ে আছে দিলের জন্যে।

রাত্রি বললো, কি ব্যাপার, খারাপ কোন কিছু?

রাধিকা বললো, তেমন কোন ব্যাপার মনে হয়না। দিল কাঁদছে, অথচ কারন বুঝা যাচ্ছেনা। এই ব্যাস্ততার মাঝে এইসব ভালো লাগে? বলতো?

রত্রি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো, একবার বাড়ীতে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসলে কেমন হয়?

রাধিকা রাত্রির চোখের দিকে খুব কঠিন হয়ে তাঁকালো। রাত্রি জানে, রাধিকা কাজকে মর্যাদা দেয় সবার উপরে। কাজ ফেলে দিলকে দেখতে যাবার মতো মহিলা সে নয়। তারপরও রাত্রি আমতা আমতা করে বললো, এখানকার ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দাও। আজকে সুমিও আছে। রোগীরা সবাই এক রকরকম স্টেবলে আছে।

রাধিকার চোখ দুটো আনন্দে ছলছল করছে, সে বললো, রাত্রি, তুমি কি বলছো?

রাত্রি বললো, হ্যা সিস্টার, তুমি আর দেরী করোনা। একবার বাড়ী থেকে ঘুরে এসো।

রাধিকা আর দেরী করলোনা। সে ছুটে বেড়িয়ে গেলো।

সুমি রাউণ্ডে বেড়িয়ে তিনশ এক নম্বর কক্ষে ঢুকবে বলে ভাবছিলো, ঠিক তখুনিই তার মোবাইলটা বেজে উঠলো। তুফানের টেলিফোন! টেলিফোনের ক্রশ কানেকশনে পরিচয়, এই ছেলেটির সাথে। আজ এই রাতের ডিউটির বেলায়, তুফানের টেলিফোনটা পেয়ে ভালোই লাগলো তার। সে হাসপাতালে নির্জন একটা জায়গা খোঁজে বেড় করে টেলিফোন আলাপে জমে উঠলো।

সুমির দেরী হচ্ছে দেখে রাত্রি খুবি দুশিচন্তায় পরে গেলো। একটু একটু ঘুমও পাচ্ছে তার। সুমি ফিরে এলে, পালা ধরে একটু ঘুমুতে পারে সে। সে একাকী নার্স ষ্টেশনে বসে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। সে একটা বড় হাই তুলে নিজে নিজেই বললো, সুমিটা যে কখন ফিরবে?

তিনশ এগার নম্বর থেকে বাবুলের নার্স কল বেজে উঠলো। রাত্রি রিসিভারের বোতামটা টিপে বললো, কি ব্যাপার বাবুল ভাই?

বাবুল বললো, অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আসছেনা, যদি একটা ঘুমের ট্যাবলেট পেতাম!

রাত্রি বললো, ঠিক আছে বাবুল ভাই আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।

রাত্রি ঘুমের ট্যাবলেট নিয়ে তিনশ এগার নম্বর কক্ষে বাবুলের বেডে গিয়ে দেখলো রতন আর বাদশাও তাকে ঘিরে বসে আছে। রাত্রি গ্লাসে পানি ঢেলে বাবুলকে ঘুমের ট্যাবলেটটা খাইয়ে দিয়ে বললো, এটা খেলে ভালো ঘুম হবে।

রাত্রি ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে, আবার ঘুরে দাঁড়ালো, বললো, ভালো কথা, আমাদের নবাগতা নার্স সুমি কি এখানে রাউণ্ডে এসেছিলো।

বাবুল বললো, নাহ, আজকে সারাদিন তো সুমি সিস্টারের সাথে কোন দেখাই হয়নি, বাদশা, তোমার সাথে কি দেখা হয়েছে?

বাদশা বললো, আমি সন্ধ্যার পর থেকে আর বাইরেই যাইনি। সুমি সিস্টার এখানে এসেছে বলে তো মনে পরেনা। কি ব্যাপার বলেনতো সিস্টার?

রাত্রি বললো, না কিছুনা, অনেক রাত হয়েছে, আপনারা সবাই ঘুমিয়ে পরেন।

সুমি যখন টেলিফোন শেষ করে নার্স ষ্টেশনের দিকে ফিরছিলো ঠিক তখুনিই সে দেখলো, বড় টর্চটা নিয়ে তাকে খোঁজতে বেড়িয়েছে রাত্রি। তাকে দেখেই বললো, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

সুমি সরাসরি বললো, একটু টেলিফোন!

রত্রি রেগে বললো, একটু টেলিফোন? তুমি হাসপাতালটাকে কি মনে করো? তোমার এই একটু টেলিফোনের ফাঁকে যদি একটা রোগী মারা যায়, কি জবাব দিহি করবে তুমি?

অন্য কোন কেউ হলে, নিজের ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইতো সুমি। রাত্রির মতো হাবাগোবা একটা মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইবার মতো মেয়ে সে নয়। তারপরও সে বললো, স্যরি সিস্টার।

রাত্রি আর কিছু বললো না, সে হন হন করে নার্স ষ্টেশনের দিকে ছুটতে লাগলো। সুমিও পেছনে পেছনে ছুটলো।

নার্স ষ্টেশনে পৌঁছুতেই, মকবুল সাহেবের বেড থেকে নার্স কল বেজে উঠলো। রাত্রি ছুটে গিয়ে রিসিভিং বোতামটা অন করে জানতে চাইলো, কি ব্যাপার?

আশচর্য্য! ওপাশ থেকে কোন কথা শুনা যাচ্ছেনা। রাত্রিকে খুবি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। সে টেবিলের উপর থেকে ফার্স্ট এইড বক্সটা তুলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বললো, তিনশ চার নম্বর রুম।

সুমি রাত্রির পেছনে পেছনে ছুটলো।

রত্রি কক্ষে ঢুকেই বললো, মকবুল সাহেব, কষ্টটা কোথায়?

মকবুল সাহেব কথা বলতে চেষ্টা করতেই রক্ত বমি করতে লাগলো। তাকে রক্ত বমি করতে দেখে সুমির মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। সে ভয়ে দেয়ালের গায়ে জড়সড় হয়ে ঠেসে দাঁড়ালো। রত্রি তার দিকে তাঁকিয়ে বললো, তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকো!

সুমি অনেকটা দিশাহারা হয়ে ছুটে বেড়িয়ে পরলো। রাতের ডিউটিতে ইন্টার্নীর আহমেদ ছাড়া আর কেউ নেই। আহমেদ সুমির কথায় তাড়াতাড়ি মকবুল সাহেবের কেস হিস্ট্রির ফাইলটা হাতে নিয়ে ছুটে চললো তিনশ চার নম্বর কক্ষের দিকে। কক্ষে ঢুকেই সে রাত্রিকে বললো, রক্তচাপ কত?

রাত্রি বললো, ৮০ বাই ৫৮। রোগীর ব্যাপারে ডাঃ আশেকের কোন বিশেষ নির্দেশ ছিলো নাকি?

আহমেদ কেস হিস্ট্রির ফাইলটা দেখে কিছুই বুঝতে পারলোনা। সে বললো, আপাততঃ ডাঃ সাকীবকে টেলিফোন করে দেখি।

আহমেদ ছুটে বেড়িয়ে গেলো সাকীবকে টেলিফোন করার জন্যে।

রাধিকা বাড়ীতে ফিরে এসে, দিলের অনবরত কান্না করার পেছনে যে কারনটা খোঁজে পেলো, তা হলো দিলের পরনের পাম্পার্স। দিলের পরনে যেই পাম্পার্সটি, তা তার দুই মাস বয়সের সময়ে কেনা। দিন দিন দিলের স্বাস্থ্য বাড়ছে। পুরনো পাম্পার্সের রাবার তার কোমরে টাইট লগছিলো। কোমরে অনেকটা দাগ পরে গেছে দিলের। রাধিকা দিলের পরনের পাম্পার্সটা চেইঞ্জ করতে করতে বললো, দেখেছো, দিলের কোমর কেটে গেছে প্রায়। এইটা পরালে কেনো?

সাকীব পায়চারী করছে ঘরের ভেতরে, বললো, চোখের সামনে এইটারই প্যাকেটই তো পেলাম।

রাধিকা বললো, এইগুলো সামনে রেখেছি, মুনমুনকে দেবার জন্যে। তুমি যে কি?

পাম্পার্স চেইঞ্জ করতেই দিলের কান্না বন্ধ হলো। রাধিকা দিলের সাথে দুষ্টুমি করছে, আর দিল খিল খিল করে হাসছে। সাকীব একটু স্বস্তি খোঁজে পেলো। এইবার মনে হয় শান্তিতে একটু ঘুমোনো যাবে। আর ঠিক তখুনি আহমেদের টেলিফোনটা এলো। আহমেদের নার্ভাস গলা শুনে সাকীব বললো, রাধিকা আমি বেড়োবো।

রাধিকা বললো, কি ব্যাপার ইমার্জেন্সী কিছু?

সাকীব বললো, বুঝতে পারছিনা। হাসপাতালে আহমেদ ছাড়া কেউ নাই। সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছেনা। আমি গেলাম।

সাকীব তাড়াহুড়া করে পোষাক বদলে ছুটলো হাসপাতালে।

সাকীব হাসপাতালে এসে, মকবুল সাহেবের বেডের কাছে এসে দেখলো আহমেদ নার্ভাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুমিও ভয়ে খুবই কাতর তখন।

সাকীব মকবুল সাহেবের হাতের নাড়ী ধরে চেক করতে করতে ডাকলো, রাত্রি?

আহমেদ বললো, মকবুল সাহেবের ব্লাড চেক করেছি, রাত্রি চেক রিপোর্ট আনতে গেছে।

রাত্রি প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো। সাকীবকে দেখে চেক রিপোর্টটা তার হাতে দিলো। সাকীব রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে দেখলো। রিপোর্ট দেখে মকবুল সাহেবের অবস্থা খুব সুবিধার মনে হলো না। রাত্রিকে বললো, অপারেশন থিয়েটারে নেবার ব্যাবস্থা করো।

রাত্রি বলতে চাইলো, দুঃখিত ডাঃ সাকীব, আমার অবহেলার জন্যে।

সাকীব বললো, দুঃখ প্রকাশ করার মতো কিছু থাকলে পরে জানাবে, এখন আগে অপারেশন থিয়েটারে নেবার ব্যাবস্থা করো।

রাত্রি আর সুমি মকবুল সাহেবের বেডের স্টপার ঢিলে করে, ঠেলে নিয়ে চললো, অপারেশন থিয়েটারের দিকে। তারা যখন হাসপাতালের করিডোর ধরে অপারেশন থিয়েটারের দিকে পাগলের মতো মকবুল সাহেবের বেডটা ঠেলে ছুটে চলছিলো, ঠিক তখুনিই দিলকে কোলে নিয়ে রাধিকাকেও ছুটে আসতে দেখা গেলো। রাধিকা আতংকিত গলায় বললো, রাত্রি?

রাত্রি বেড ঠেলতে ঠেলতে বললো, ইমার্জেন্সী অপারেশন।

আশেককেও খবর পাঠানো হয়েছিলো। সে ছুটতে ছুটতে অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে ঢুকলো।

অপারেশন শুরু হয়েছে। রাত্রি আর সুমি অপারেশন থিয়েটারের বাইরে আতংকিত হয়ে অপেক্ষা করছিলো। রাত্রি হঠাৎই সুমির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। সুমি কিছুই বুঝে উঠার আগেই সে ঠাস করে তার গালে সজোরে একটা চর মেরে বসলো। সুমি লক্ষ্য করলো ওপাশ থেকে রাধিকা এগিয়ে আসছিলো এদিকে। তাকে চর মারতে দেখে সে থেমে গেলো।

সুমি রেগে গিয়ে বললো কি ব্যাপার, আমার কি দোষ? আমাকে চর মারলে কেনো?

রাত্রি রাগে কাঁপছে, সে বললো, সবই তো তোমার দোষে! তুমি যদি ঠিকমতো রাউণ্ডে যেতে, এমন কোন ব্যাপার ঘটতোনা।

ছোট ছোট অবহেলা, অনেক বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে, ছোটকালেই কথাটা সুমি শিখেছিলো। রাউণ্ডে যাবার ব্যাপারটা তার কাছে খুবি নগন্য মনে হয়েছিলো। অথচ, রাত্রির মতো একটা বোকা আনাড়ী নার্স তাকে আঙুলী দিয়ে শিখিয়ে দিলো ব্যাপারটা নুতন করে। সুমি রাগ, অভিমান আর লজ্জা নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ লাল করে তাঁকিয়ে রইলো রাত্রির দিকে। তারপর, ছুটে পালানোর চেষ্টা করলো অন্যত্র।

সকীব আর আশেকের কল্যানে মকবুল সাহেবের অপারেশনটা খুব ভালোভাবেই সমাপন হলো। রাত্রি অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলো অপারেশন থিয়েটারের দরজার সামনে। সুমি কিছুটা দূরে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে বসে কাঁদতে ছিলো। অপারেশন শেষে মকবুল সাহেবের বেডটা, রাত্রি একা একাই ঠেলে চললো।

মিনা রায় এমন একটা সংবাদ শুনে বাড়ীতে ঘুমিয়ে থাকতো পারলোনা। হন হন করে ছুটে এলো হাসপাতালে। আশচর্য্য, লতিফাকেও দেখা গেলো নার্স ষ্টেশনে ঢুকতে। সুমি ভয়ে ভয়ে রত্রির পেছনে পেছনে তিনশ চার নম্বর রুমে গিয়ে ঢুকলো। মকবুল সাহেবের হুশ নেই। তাকে অক্সিজেন দেয়া। রাত্রি কম্বলটা মকবুল সাহেবের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে নিজে নিজেই বললো, স্যরি মকবুল সাহেব, আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে দুঃখিত।

লতিফা দরজা ঠেলে ঢুকলো তিনশ চার নম্বর রুমে। তার চেহারা খুবই কঠিন। সে কঠিন গলাই বললো, এই তোমরা দুইজন। নার্স ষ্টেশনে তোমাদের ডাকা হচ্ছে।

রাত্রি অসহায়ের মতো বললো, কিন্তু, মকবুল সাহেবকে এভাবে রেখে?

লতিফা বললো, মকবুল সাহেবকে আমি দেখছি, তোমরা নার্স ষ্টেশনে যাও।

নার্স ষ্টেশনে তদন্ত কমিটির বৈঠক বসেছে। সাকীব বললো, অপারেশন সাকসেসফুল, আশা করি আর কোন বিপদ নেই।

মিনা রায় বললো, আমি সত্যিই দুঃখিত ডাঃ সাকীব।

তারপর রাত্রিকে লক্ষ্য করে বললো, তাই বলে রাউণ্ডে ফাঁকি দেয়া এ কেমন কথা?

রাত্রি বললো, আমি ঠিকমতো নির্দেশ করেছিলাম সুমিকে। অথচ, সে কার সাথে যেনো টেলিফোনে ব্যাস্ত হয়ে পরেছিলো। আমি আমি?

মিনা রায় রাত্রিকে থামিয়ে দিলো, বললো, রাত্রি, সুমিকে এমনভাবে এক তরফা দোষ দেয়া তোমার ঠিক না। তুমি সুমির তদারককারী। সুমির ভুল মানে, তোমার অনেক দায় দায়ীত্ব রয়েছে তাতে, কারন তুমি সুমির তদারককারী।

মিনা রায় একটু থেমে রাধিকার দিকে তাঁকিয়ে বললো, তারপর, সিস্টার রাধিকা, হাসপাতালে যখন সমস্যাটা ঘটে, তখন তুমিও তো হাসপাতালে ছিলেনা শুনছি, ব্যাপার কি বলতো?

রাধিকা মাথা নত করে বললো, স্যরি, আমি?

রাত্রি বলতে লাগলো, রাধিকা সিস্টারের কোন দোষ নেই। আসলে, সিস্টারের মেয়েটার শরীর খারাপ ছিলো বলে, আমিই যেতে বলেছিলাম।

সাকীব বললো, সেই ব্যাপারে আমারো অনেক দায় দায়ীত্ব ছিলো? আসলে আমি?

মিনা রায় সাকীবকে থামিয়ে দিলো, আপনি থামেন ডাঃ সাকীব।

রাত্রি আবারো বলতে লাগলো, আসলে রাধিকা সিস্টার যেতে চায়নি, আমি অনেকটা জোড় করেই!

রাধিকা রাত্রিকে লক্ষ্য করে বললো, চুপ করো রাত্রি, আমি বলছি।

তারপর, মিনা রায়ের দিকে ফিরে মাথা নত করে বললো, আমি সত্যিই দুঃখিত, আজকের এই ঘটানার সব দায় দায়ীত্ব আমার। আমাকে ক্ষমা করুন।

লতিফা ফিরে এলো নার্স ষ্টেশনে। সে বললো, মকবুল সাহেবের আত্মীয় স্বজনরা এসেছে। সবাই দ্বিতীয়বার আপারেশনের কারন জানতে চাইছে।

মিনা রায় বললো, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

তারপর সাকীবকে লক্ষ্য করে বললো, ডাঃ সাকীব কি আমার সাথে আসবেন একটু?

সকালবেলায় ডিউটি শেষ হতেই হাসপাতালের সামনে অপেক্ষা করছিলো সুমি তুফানের জন্যে। রাত্রি সুমিকে দেখে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো, এই মেয়ে, কালকে রাতের ঘটনাটা তোমার কাছে কি মনে হয়?

রাত্রির কথায় সুমি খুব বিরক্ত হলো। পাত্তা দিতে ইচ্ছে করলোনা, তারপরো বললো, ডিউটি শেষ, এখনো কি কোন আদেশ নির্দেশ করবে নাকি তুমি?

রাত্রি রাগে কটমট করছে। ঠিক তখুনিই লাল রংয়ের গাড়ীতে করে হাসপাতালের সদরে এসে থামলো তুফান। সুমি বললো, এতো দেরী কেনো তোমার? সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

তুফান বললো, স্যরি রাস্তায় যে জ্যাম একটু দেরী হয়ে গেলো।

সুমি গাড়ীতে ঢুকে রাত্রিকে হাত নড়িয়ে বললো, বাইই।

রাত্রি যে রাগে থমথম করছে বুঝতে পারছিলো সুমি। অথচ, তার খুব মজা লাগলো রত্রির রাগ ভর্তি চেহারাটা গাড়ীর উইণ্ডো গ্লাসে দেখে।

চলবে